শিল্পী : তরুণ দে

জাতক : সেরা লোককাহিনী

রুমকী মণ্ডল
(গবেষিকা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

জাতক বহুচর্চিত এক বৌদ্ধ সাহিত্য যা রামায়ণ মহাভারতের মতো ভারতীয় জাতিসত্ত্বার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। জাতক কী? থেরবাদী বৌদ্ধ মতে 'জাতক' ভগবান বুদ্ধের পূর্বজন্মবৃত্তান্ত। থেরবাদ, স্থবিরবাদ, ও হীনযান বলতে একই সম্প্রদায়কে বোঝায়। যারা বুদ্ধের অনুশাসনগুলি যথাযথ ভাবে পালন করেন। তিনি বোধিসত্ত্ব রূপে নানা যোনিতে জন্ম-জন্মান্তরে চারিত্রিক উৎকর্ষতার মধ্য দিয়ে মৈত্রী-করুণা-মুদিতা-উপেক্ষা ভাবনার দ্বারা প্রজ্ঞামার্গে পৌঁছে যান। অন্তিম জন্মে বোধি অর্জনান্তে তিনি সম্যক সম্বুদ্ধরূপে দেব মনুষ্যলোকের পথদ্রষ্টা শিক্ষক (লোকবিদূসত্থাদের মনুস্মানং) হন। তিনি ধর্মপ্রচারকালে নিজের এই সাধনাকে কাহিনীর রূপকের মোড়কে বলতেন। কালে কালে তা বোধিসত্ত্বকাহিনীরূপে জনমানসে জনপ্রিয়তা লাভ করে। এই বোধিসত্ত্ব কাহিনীগুলি পালি-ত্রিপিটকের দ্বিতীয়ভাগ সুত্তপিটকের অন্তর্গত খুদ্দকনিকায়ের দশম গ্রন্থ 'জাতক' এ সংকলিত হয়েছে। সংগ্রহটি যেমন জাতক রূপে অভিহিত সেইরকম অন্তর্ভূক্ত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কাহিনীগুলোও জাতক। কাহিনীগুলির জনপ্রিয়তা দেশকালের

সীমা অতিক্রম করেছিল সম্ভবতঃ ইতিহাসের কাল্পনিক সময়সরণী উদ্ভাবনের বহুপূর্বে। এমনকি কিছু কাহিনীর সূত্র কৃষিযুগের গোড়ার কথা অর্থাৎ সিন্ধু সভ্যতার সমসাময়িক বলেও অনুমান করতে পারি।

সিংহলী ইতিহাস অনুসারে খ্রীঃ পঞ্চম শতকে ভারতের মগধ অঞ্চলের ঘোষ নামক গ্রাম থেকে সুদূর সিংহলে (বর্তমান শ্রীলঙ্কা) আগমন ঘটে বৌদ্ধ অর্থকথাচার্য বুদ্ধঘোষের। যিনি অন্যান্য গ্রন্থের সঙ্গে 'জাতক অট্ঠকথা' নামক সিংহলীভাষায় রচিত জাতকের টীকা গ্রন্থটিকে পালি ভাষায় অনুবাদ করেন। সাধারনভাবে কী আছে এই জাতকে? ভগবান বুদ্ধ প্রচলিত স্থানীয় ভাষায় (প্রাকৃত ভাষায়) সাধারণ মানুষদের কাহিনীমূলক উপদেশ দিতেন এবং তাদের জীবনের দুঃখ দুর্দশা থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করতেন। জাতক শুধুমাত্র রাজা-মহারাজা-শ্রেষ্ঠী-প্রজাবর্গের জীবন আলেখ্য নয় প্রান্তিক মানুষের অভিব্যক্তির বৈচিত্র্যময় রূপ। দেশ ও জাতির বহু অনাস্বাদিত জীবনচর্যার ইঙ্গিত এখানে পাওয়া যায়। কথাচ্ছলে সদুপদেশ দানের রীতি বহু প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে প্রচলিত। আরণ্যক জীবনে প্রাচীন মানব ও মৃগয়াজীবী মানুষ, সর্প, শৃগাল কাক, গর্দভ ও বানরাদির প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে সেই চরিত্রগুলো অবলম্বন করে সহজ সাধারণ ধর্মবোধ শিক্ষা দিতেন, ক্রমে সমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানব মনে জটিলতা বৃদ্ধি পেল এবং স্বাভাবিক ভাবেই অনেক জটিলধর্ম ধর্মপ্রচারকদের উপদেশের অঙ্গীভূত হল। এইভাবে বহু লোককথার উৎপত্তি হল। আমরা যদি লোককথার গোড়ার দিকে তাকাই তবে দেখা যায় মানুষ যখন চাষ করতে শিখল, তার ঘরে খাদ্যমজুত থাকল, খাবারের খোঁজে দিনরাত পরিশ্রম বন্ধ হল, অবসর সময় কাটাতে লাগল তখন তারা গল্প করতে বা গল্প বলতে শুরু করল, শুরু হল সাধারণ লোকের গল্প বলা। যেগুলি সরস ও সারগর্ভ লোকে তা মনে রাখত আর যেগুলি অসার ও নীরস সেগুলি উৎপত্তির পরই বিলুপ্ত হত। এইসব লৌকিক সংস্কার ও লোককথা ক্রমাগত পরিবর্তন ও পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে কালে কালে সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করল। লোককথার সেই ধারাটি জাতক কাহিনীতে প্রবাহিত হয়েছে।

জাতক কাহিনীর মুখ্য বক্তা স্বয়ং। কাহিনীগুলির গঠনশৈলী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তিনটি স্তরে বিন্যস্ত ১। অতীত বস্তু (অতীত বস্থু), ২। বর্তমান কাহিনী (পচ্চুত পন্ন বত্থু), ৩। সমবধান (সমধান অর্থাৎ অতীত বস্তুতে বর্ণিত চরিত্রের সাথে বর্তমান বস্তুতে বর্ণিত চরিত্রের অভেদ প্রদর্শন)। জাতক কাহিনীর নামকরণ হয় অতীত বস্তুকে আশ্রয় করে। অতীতে যাঁরা এই বোধিসত্ত্বের শত্রু-মিত্র সহচরের ভূমিকায় ছিলেন বর্তমানে তাঁরাই কোন কোন ভাবে বুদ্ধের পার্শ্বচরিত্র। অর্থাৎ প্রত্যুৎপন্নবস্তুতে যিনি বুদ্ধ অতীত বস্তুতে তিনি মৃগ-মর্কট-মৎস্য-কুর্ম ইত্যাদি রূপে উপস্থিত। আবার বর্তমানে যে মানবেতর জীব সে ভবিষ্যতে দুর্লভ মনুষ্যপদ লাভ

করতে পারে। অতএব স্থান ও কালের প্রেক্ষিতে সমস্ত জীবই একই স্কন্ধের অঙ্গীভূত। বৌদ্ধগণ মনে করেন জীব হল পঞ্চস্কন্ধ অর্থাৎ রূপ বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কার-বিজ্ঞানের সমষ্টি মাত্র। পূর্ববর্তী জীবনের কৃত ও অকৃত কর্মের ফলে সঞ্চিত কর্মফল ভবিষ্যৎ জন্মের নিয়ন্ত্রক। জীবগণ নিজ নিজ কর্মশক্তি অনুসারে বিবিধ স্তরে জন্মগ্রহণ করে। এমনকি জীবের পরবর্তী জন্ম কোনরূপে হবে দেবরূপে, মনুষ্য নাকি পশুপক্ষী কীটপতঙ্গরূপে হবে, পুং রূপে না নারীরূপে হবে, শ্রীসম্পন্ন না শ্রীহীন হবে— এ সমস্তই কর্মের অনুসিদ্ধান্ত মাত্র।

যদি ধরে নেওয়া হয় বৌদ্ধগণ যে জাতকের গল্প বলতেন তার শ্রোতাগণও বৌদ্ধ ছিলেন তবে তাদের বিভাজন দুভাগে করা যেতে পারে— (১) সাংঘিক বৌদ্ধ অর্থাৎ ভিক্ষু ও শ্রমণগণ (২) গৃহী বৌদ্ধ অর্থাৎ উপাসক ও উপাসিকা। এছাড়াও আমরা বৌদ্ধ সাহিত্যে আরণ্যক বৌদ্ধগণের জীবনযাত্রা সম্পর্কেও জানতে পারি। যাঁরা কখনও একাকী গভীর অরণ্যে বা কখনও পাহাড়ের গুহায় নির্জনে ধ্যান সাধনায় রত থেকে জীবন কাটাতেন। এই আরণ্যক শ্রমণগণ শ্মশানভূমিতে পরিত্যক্ত জীর্ণবস্ত্র বা কখনও বল্কল ধারণ করতেন বলে এঁদের অপরনাম পাংশ্যকুলিক। তাঁরা ধুতাঙ্গ ব্রত পালন করতেন। যাঁর নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে সারাবছর অরণ্যে বাস করতেন তাঁদের ধুতাঙ্গ ব্রত উৎকৃষ্ট রূপে গণ্য হত এবং যাঁরা বর্ষার চারমাস গ্রামে থেকে আটমাস অরণ্যে বাস করতেন তাঁরা হলেন মধ্যম আরণ্যক। মৃদু আরণ্যক ধুতাঙ্গ ব্রতধারীগণ হেমন্ত কালেও গ্রামে বাস করতে পারতেন।

পালি সাহিত্যে বর্ণিত ধুতাঙ্গগুলির নিম্নলিখিত তালিকা পাওয়া যায় ঃ

(১) পাংসুকুলিক অঙ্গ - ছিন্ন পোষাক সেলাই করে পরিধান করা।
(২) তেচীবরক অঙ্গ - তিনটি পৃথক অংশ সেলাই করে পরিধান।
(৩) পিণ্ডপাতিক অঙ্গ - ভিক্ষান্নের জন্য বিচরণ।
(৪) সপদানচারিক অঙ্গ - গৃহ থেকে গৃহান্তরে ভিক্ষার্থে গমন।
(৫) একাসনিক অঙ্গ - একাসনে বসে খাদ্যগ্রহণ।
(৬) পত্তপিন্ডিক অঙ্গ - ভিক্ষান্ন গ্রহণ।
(৭) খলুপচ্ছাভিত্তিক অঙ্গ - পরবর্তী সময়ে পুনরায় খাদ্যগ্রহণে বিরত থাকা।
(৮) আরঞ্ঞিক অঙ্গ - অরণ্যে বসবাস।
(৯) রুক্খমূলিক অঙ্গ - বৃক্ষমূলে বসবাস।
(১০) অব্ভোকাসিক অঙ্গ - উন্মুক্ত স্থানে বসবাস।
(১১) সোসানিক অঙ্গ - শ্মশানে বসবাস।
(১২) যথাসম্মতিক অঙ্গ - যত্রতত্র শয্যা গ্রহণ।
(১৩) নেস্সজ্জিক অঙ্গ - উপবেশনে রাত্রি যাপন বা নিদ্রা হতে বিরতি।

যদি আলোচ্য বিষয়টিকে অন্যভাবে আলোচনা করা হয় তবে বলতে হবে সৃষ্টির আদিযুগ থেকে আরণ্যক পৃথিবীর বুকে মানুষ ও জীবজন্তু একই সাথে বসবাস করে এসেছে। নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য যেমন সংগ্রাম করেছে সেইরকম মানুষ এবং মনুষ্যেতর প্রাণী পরস্পরকে হত্যা করে নিজেদের ক্ষুন্নিবৃত্তি ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করেছে। বিশেষতঃ মানুষ পশুকে শুধু খাদ্যরূপে গ্রহণ করেনি পশুচর্ম পরিধান করেছে; চাষ ও ভারবহনের কাজে লাগিয়েছে; হাড়, নখ, দাঁত দিয়ে অলঙ্কার প্রস্তুত করেছে। পাশাপাশি সংবেদনশীল মানব মন আবার তাঁর অরণ্যচর পূর্বপুরুষদের জীবনচর্যা, অরণ্যের গাছপালা, পশু-পাখী, নদ-নদী, খাল-বিল, পাহাড়-পর্বত, ঝোপ-ঝাড়, বন-জঙ্গলকে মুছে ফেলতে পারেনি। বরং ধীরে ধীরে অবিস্মৃতির গভীর থেকে স্মৃতির পর্দায় উঠে এসেছে। সেই সকল অরণ্যের অভিজ্ঞতা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পরিবেশন করতে গিয়ে নিজেদের আদিম বিশ্বাস, রীতি-নীতি ও সংস্কারের বিষয়কে কল্পনার রঙে রাঙিয়ে তুলেছে। ভারতীয় জীবনে মৃগশাবক, হস্তিশিশু, বানররাজ, কলহংস, চক্রবাল দম্পতি, শুক-সারি মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়ে আপনজনে পরিণত হয়েছে। তাই জাতক কাহিনীর চরিত্রগুলো মানুষের এত কাছের। কাহিনীগুলিতে সমাজবদ্ধ মানুষ ও প্রাণীদের জীবনচিন্তার বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন 'শৃগাল জাতকে দেখা যায় এক শৃগাল জনৈক সিংহকুমারীকে বিবাহ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। কিন্তু সিংহকুমারী প্রস্তাবটিকে ভৎসনা করে তাকে ফিরিয়ে দেয়। শৃগালের সেই ইচ্ছা পূরণ না হওয়ায় সে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। তার এই প্রাণনাশের কাহিনীর মধ্যে দিয়ে বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়ানোর প্রবচনকে স্মরণ করানো হয়। অপরদিকে 'ময়ূরজাতকে' দেখা যায় এক ময়ূর দিবাসন্ধ্যা সূর্যের স্তব করে আত্মরক্ষা করে। শেষে এক ময়ূরীর কণ্ঠস্বর শুনে কামাসক্ত হয়ে মন্ত্রপাঠ না করে কামপাশে আবদ্ধ হয়। প্রাচীনকালে ঋষি-মহর্ষিগণও বহুবর্ষব্যাপী সাধন ভজন করে অবশেষে রমণী কণ্ঠের আহ্বানে ও তার শরীরী আকর্ষনে পদস্খলিত হন। আবার 'সোমদত্ত জাতকে' আমরা কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে থাকি। যেখানে দেখা যায় সোমদত্ত তার জড়বুদ্ধি সম্পন্ন লাজুক পিতাকে রাজসভায় বলার জন্য একবছর ধরে একটি শ্লোক শিখিয়েছিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ পিতা সময়কালে আর বিপরীত অর্থ আবৃত্তি করলেন। কারণ তিনি এতই লাজুক ছিলেন যে অপরিচিত ব্যক্তির সামনে গুছিয়ে কথা বলতে পারতেন না। মুর্খের কাজকর্মের পরিনাম দেখে কৌতুক রস সৃষ্টির যে ধারা জাতকে দেখা যায় আধুনিক প্রচলিত লোককথার জগতেও তার ধারাবাহিকতা লক্ষণীয়।

দিনে দিনে শ্রোতা যত বেড়েছে তত বেড়েছে গল্পের উপকরণ। প্রথমদিকে গরু-ছাগল-কুকুর-বিড়াল-হরিণ প্রভৃতি প্রাণীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গল্পের রসে রসায়িত

হত। ক্রমে সেই সব পশুপাখীর মুখে ভাষা আরোপ করে এবং বাক্‌শক্তি সম্পন্ন বৃক্ষ ও বৃক্ষদেবতার আবির্ভাব ঘটিয়ে কাহিনীর ধারা অগ্রসর হয়েছে। বক্ত জানতেন দৈনন্দিন জীবন থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে গল্পের মধ্য দিয়ে নীতি শিক্ষা দিলে তা শ্রোতার মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী হবে। সেইসব কথার আসরে বক্তা ও শ্রোতা উভয়েই বিভোর হয়ে থাকতেন— বক্তা তার সৃষ্টির আনন্দে ও শ্রোতা নতুনের স্বাদে। শুধু তাই নয় কালের প্রবাহে প্রচলিত লোককথাগুলি সাহিত্যের অন্তর্লীন ক্ষেত্রে প্রবাহিত হয়ে মূল শাস্ত্রাধারে নথিভুক্ত হয়েছে। চিরন্তন নীতি কথামূলক লোককথার বৈশিষ্ট্য গুলি — তথাকথিত প্রচলিত বিশ্বাস, দুর্বল ও অসহায়ের প্রতি দয়া, কখনও বা সহানুভূতির মিথ্যা আশ্বাস, দুর্বলতার সুযোগ সন্ধান, ধূর্তের ফন্দী, কৃপন, নির্বোধ-খলচরিত্রের প্রতি ঘৃণা, যৌবনের মানসিক ও দৈহিক আকাঙ্খা পূরণের অভিপ্রায়, মন্ত্রশক্তির কলাকৌশল ইত্যাদির বহুল প্রচলিত কাহিনী জাতকে স্থান পেয়েছে।

জাতক কাহিনীগুলির ভারতের সীমা অতিক্রম করে বহির্ভারতে জনপ্রিয়তা অর্জনের অন্যতম কারণ ছিল বাণিজ্য। বৌদ্ধযুগে বাণিজ্যের বিবরণ সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে 'মহাবণিজ জাতক', 'কূটবণিজ জাতক', 'বাবেরু জাতক', 'তুন্তলনালী জাতক', 'সেরিবাণিজ জাতক', 'সমুদ্দ 'বাণিজ জাতক', 'সুপ্পারক জাতক', 'পন্ডর জাতক' প্রভৃতি কাহিনীতে। উক্ত কাহিনীগুলি ইঙ্গিত দেয় তৎকালীন যুগে অন্তর ও বহির্বাণিজ্যের অভূতপূর্ব বিস্তার হয়েছিল। দেশের অন্তর্বাণিজ্য স্থলপথেই গোশকটের মাধ্যমেই পরিচালিত হত। 'গুপ্তিল জাতকে' দেখা যায় বারাণসীর বণিকেরা গোশকটে উজ্জয়িনী পর্যন্ত বাণিজ্য করতে যেতেন এবং 'গান্ধার জাতকে' দেখা যায় বিদেহের (মিথিলা) বণিকেরা গান্ধার পর্যন্ত বাণিজ্য করতে যেতেন। জাতকসহ অন্যান্য কাহিনীতে শ্রাবস্তীনিবাসী শ্রেঠী অণাথপিন্ডদের পঞ্চশত গোশকট নিয়ে রাজগৃহে পণ্য বিক্রয় করবার কাহিনীর উল্লেখ আছে। উত্তরাপথ, দক্ষিণাপথ এবং গঙ্গানদী তীরবর্তী পূর্বদেশ থেকে পশ্চিমে পুরুষপুর এবং দক্ষিণে নর্মদা নদীর তীরবর্তী ভৃগুকচ্ছ পর্যন্ত অন্তর্বাণিজ্য চলত। আরো দক্ষিণে কৃষ্ণা, গোদাবরী, তুঙ্গভদ্রার তীর ধরে পশ্চিম উপকূল পর্যন্ত ব্যবসাবাণিজ্য ছড়িয়ে পড়েছিল। বহির্বাণিজ্য চলত মূলত জলপথে বা সমুদ্রপথে। তখন বণিকগণের সমুদ্রপথে কতদূর পর্যন্ত গতিবিধি ছিল তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয় তবে কিছু কিছু জাতক কাহিনী থেকে যে আভাস পাওয়া যায় তার থেকে একথা বলা যায় যে এদেশীয় বণিকরা ময়ূর নিয়ে ব্যাবিলন পর্যন্ত যাত্রা করতেন (বাবেরু জাতক)। শঙ্খ ও মহাজনক জাতকে আছে বণিকেরা ধনপ্রাপ্তির আশায় সুবর্ণভূমিতে যেতেন। সুবর্ণভূমি পূর্ব উপদ্বীপ অর্থাৎ ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, মালয় ও আনাম প্রভৃতিতে গঠিত ভূখণ্ড, বর্তমান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া।

'বলাহস্ব জাতকে' তাম্রপর্ণী বন্দরের উল্লেখ আছে। অকীর্তি জাতকে সাগর গর্ভস্থ নাগদ্বীপ ও কারদ্বীপের নাম দেখা যায়। নাগদ্বীপ জাফনার নিকটবর্তী যা সিংহলের অংশ বিশেষ। এর থেকে অনুমান করা যায় যে সেইসময় দেশীয় বণিকগণ জলপথে পশ্চিমে পারস্য উপসাগর, দক্ষিণে লাক্ষাদ্বীপ, দক্ষিণপূর্বে মালয়, সুমাত্রা, জাভা এবং পূর্বে ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত পাড়ি দিতেন। দীর্ঘদিন ব্যবসা বাণিজ্যের সুবাদে ভারতীয় এবং বহির্ভারতীয় বণিক সম্প্রদায়গুলির মধ্যে এক মেলবন্ধন গড়ে উঠেছিল। ফলে তাদের ভাষা ও সাংস্কৃতিগত বৈষম্য সত্ত্বেও নিজেদের মধ্যে ভাববিনিময়ের সার্থে অবশ্যই কোন সাধারণ রীতি গড়ে তুলেছিলেন যার সাহায্যে একে অপরের সংস্কৃতিকে সম্মান জানাতেন, নিজেদের অভ্যাস, দেশ ও দেশবাসীর সাধারণ জীবনযাত্রা বা লোককথাগুলিকে তুলে ধরতেন এবং বাণিজ্যের অবসরে গল্পগুজব করতেন, তর্ক-বিতর্ক করতেন, কখনও বা নিজেদের গল্পের রসে বিভোর হয়ে অলস কালবিক্ষেপ করতেন। কথাতত্ত্বের আলোচনা করতে গিয়ে জাতকের ন্যায় গল্পগুলি যে আবশ্যক তা বলা বাহুল্য, তাই জাতক কাহিনীগুলিকে বার্তামূলক কাহিনী বলাই শ্রেয়।

মানুষ চিরকালীনই উপমা প্রয়োগ প্রবণ। পর্যবেক্ষণশীল মানুষ সকল দেশেই কাকের লোলুপতা, শৃগালের ধূর্ততা, সিংহের সাহসিকতা প্রভৃতি দোষগুণ দেখতে পেত এবং সেগুলি অবলম্বন করে সমসাময়িক লোকের চরিত্র সমালোচনা করত। এইভাবে জনসাধারনকে উপদেশ বা নৈতিক শিক্ষা দেওয়া হত। আমরা 'লটুকিক জাতক' এ দেখি এক অসহায় পক্ষীমায়ের গল্প। যে আপ্রাণ চেষ্টা করে ও শক্তিশালী হস্তীযূথের থেকে শাবকদের বাঁচাতে সক্ষম হয়নি ঠিকই কিন্তু নিজে এক ক্ষুদ্র পক্ষী হয়েও উপস্থিত বুদ্ধির জোরে কাক, নীলমক্ষিকাও ব্যাঙের সাথে বন্ধুত্ব করে দুষ্ট হাতিকে জব্দ করে প্রতিশোধ নিয়েছিল। আবার 'জম্বুখাদক জাতকে' দেখা যায় কাক ও শৃগাল দুটি অতি ধূর্ত প্রাণী নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য একে অপরের সাথে মিত্রতা গড়ে তুলেছিল। 'ধর্মধ্বজ জাতকে' দেখা যায় চরম বিশ্বাসঘাতক এক কাক তপস্বীর ছদ্মবেশে ধর্মনিষ্ঠার ভাণ করে পক্ষীকুলের সর্বনাশ করেছে। 'শুংশুমার জাতকে' আমরা নির্বুদ্ধি সম্পন্ন কুমীরের এবং সুবুদ্ধি সম্পন্ন বানরের পরিচয় পেয়ে থাকি। সেখানে দেখা যায় মর্কট ও মর্কটপত্নী মিলে বৃক্ষডালে উপস্থিত বানরের কলিজা খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও বানর তার নিজ তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জোরে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়। জাতক কাহিনগুলির বহুস্থানে শৃগালের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। একদিকে সে যেমন ধূর্ত, বিশ্বাসঘাতক, শঠ, অকৃতজ্ঞ, সুচতুর অপরদিকে সে বুদ্ধিমান ও বিপন্নের বন্ধু। শৃগাল জাতক হল এক অকৃতজ্ঞ শিয়ালের কাহিনী। সেখানে দেখা যায় এক শৃগাল বিপদে পড়ে জনৈক ব্রাহ্মণের সাহায্য প্রার্থী হয়। সেই ব্রাহ্মণও সাধ্যমত শৃগালকে সাহায্য করে। কিন্তু শৃগাল তার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করার

বদলে ব্রাহ্মণকে মিথ্যা দুশো কাহন ধনপ্রাপ্তির লোভ দেখিয়ে তার উত্তরীয়র ওপর মলত্যাগ করে পলায়ন করে। ডঃ আশুতোষ ভট্টচার্যের কথায় আর্যগণই আর্য ও অনার্য উপাদান নিয়ে সমগ্র পশুজগতের মাধ্যমে একটি নতুন চিত্রকল্পের পরিচালনা করেন। যেখানে রাজপথে অভিষিক্ত হয় সিংহ এবং মন্ত্রীপদ পায় শৃগাল। এই মন্ত্রীপদ পাওয়ার জন্য তাকে বিজ্ঞ ও বিচণক্ষ বলে কল্পনা করা হয়। জাতকে বিশেষ মর্যাদাপ্রাপ্ত প্রাণী হস্তী। তার বিপুলকায়, সর্বলক্ষণ, আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা অনুনকরণীয়। ঘোড়া অসীম গতিবেগের প্রতীক। জাতকের পশুপাখী সাংসারিক বুদ্ধিতে, আত্মরক্ষায়, সন্তান পালনে, স্থূলচাতুরিতে ও অকৃতজ্ঞতায় মানুষের থেকে কোন অংশে কম নয়।

প্রাচীন ভারতীয়গণ অরণ্যের পশুপাখীর সাথে বৃক্ষ, তৃণ, লতা-গুল্মকেও নিজ জীবনের সঙ্গী করে নেয়। বৃক্ষ তাদের কাছে মিত্রস্বরূপ, ধৈর্য্য, শান্তি ও সেবার প্রতীক। লোককথায় বৃক্ষের নানা ভূমিকা কখনও সাহায্যকারী বন্ধু, কখনও প্রতীকী, কখনও দেবতা-পিশাচ-যক্ষ-নাগ এর আশ্রয় স্থল। যেহেতু জাতক বাস্তবমুখী জীবনদর্শনকে স্বীকার করে নিয়েছে তাই এখানে অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ কম। জাতকের বোধিসত্ত্ব তেতাল্লিশটি জাতকে বৃক্ষ বা বাক্‌শক্তিসম্পন্ন বৃক্ষদেবতা। যেমন কুশনালী জাতকে দেখা যায় এক কুশগুচ্ছের দেবতা এক মহাবৃক্ষদেবতার বিমান রক্ষা করেছিলেন। পালিতে বিমান হল দেবগণের বাসস্থান। কাহিনীটির মুখ্য বিষয় হল মিত্রধর্ম প্রতিপালন করবার ক্ষমতাই মিত্রতার প্রমাণ। যে প্রকৃত মিত্র, সে জাতিগোত্রাদি ভেদে নীচকক্ষই হোক বা সমকক্ষ, সর্ব অবস্থাতেই সম্মানের পাত্র, তার উপর যে দায়িত্ব ভারই সমর্পন করা হোক সে তা সযত্নে পালন করবে। ব্যঘ্র জাতকে বর্ণিত হয়েছে বৃক্ষদেবতা বন থেকে বাঘ, সিংহ জাতীয় হিংস্র প্রাণীদের বিতাড়িত করে শেষে নিজেই বিপন্ন হয়েছিলেন। কারণ হিংস্র জন্তুর ভয় দূর হওয়াতে গ্রামবাসী বনজঙ্গল কেটে পরিস্কার করে দিতে চেয়েছিল। এইভাবে বৃক্ষের মধ্যে যে প্রাণের আদিম ভাষা স্তব্ধ ছিল তা লোককথায় বা নৈতিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত হয়েছে।

সুপ্রাচীন যুগে মানুষ সহজ সরল বিশ্বাসে সকল চেতন অচেতন বস্তুতে দৈবশক্তি আরোপ করত। এইভাবে গাছপালা-পশু-পাখী, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত প্রভৃতি মানুষের ভক্তির অর্ঘ্য লাভ করেছে। ভারতে অনুপ্রবেশকারী আর্য গোষ্ঠীর মানুষরাও ভারতে প্রবেশের পূর্বেই প্রকৃতি পূজারী ছিলেন। তাঁরা মনে করতেন যাগযজ্ঞই দেবতাদের প্রসন্ন করার একমাত্র উপায়। ভারতে প্রবেশ করেও তাঁরা নিজেদের সেই বিশ্বাস ধরে রেখেছিল। ফলে তৎকালীন সমাজে যাগযজ্ঞের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়। আর্যগণ যুদ্ধ জয়, পুত্রলাভ, স্বর্গগমন ইত্যাদির জন্যও যাগযজ্ঞ করতেন। কিন্তু সিন্ধুসভ্যতার যুগে ধ্যানচর্চা বা তপস্যার কথাই প্রাধান্য পেয়েছে। তাই সিন্ধুসভ্যতায় ঋষি বা

তপস্বী হচ্ছে প্রধান ব্যক্তিত্ব। অপরদিকে আর্যসভ্যতায় পুরোহিত বা তথাকথিত আর্যেতর ব্রাহ্মণ ছিল সর্বেসর্বা কারণ তিনি নাকি দেবতা ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থের কাজ করেন। বাস্তবিক পক্ষে আর্যসভ্যতার সর্বোচ্চ আদর্শ ছিল স্বত্ব গোষ্ঠীর শক্তিবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থার বিধান। তাদের ধর্মীয় জীবনের লক্ষ্যই ছিল স্বর্গলাভ। আর্যসভ্যতায় সর্বাধিক প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে বৈষয়িক উন্নতি, ধন, ক্ষমতা, যশ এবং এগুলি প্রাপ্তির জন্য যাগযজ্ঞের বিধানকে। তাদের আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল (১) কর্মানুসারে চতুবর্ণের সৃষ্টি বা জাতিভেদ প্রথা। (২) বেদ সাহিত্যের পরিচয়।

আমাদের প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার ধর্মীয় বিশ্বাস ছিল আর্যদের থেকে আলাদা। সেখানে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। আত্মোৎসর্গ, আত্মত্যাগ, ধ্যান-ধারণা, পুনর্জন্ম, কর্ম ইত্যাদিকে। তাই বলা হয় খ্রীপূঃ ১৫০০-৬০০ এই এক হাজার বছর হল সিন্ধু ও আর্য এই দুই বিপরীত মুখী সভ্যতার ক্রম সংঘাতের ইতিহাস। আর্যরা যতই ক্রমশঃ ভারতের পূর্বদিকে অগ্রসর হয় এবং স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে, তখন থেকে এই দুই বিপরীতমুখী ধর্মীয় আদর্শ একে অন্যের উপর বিস্তার করতে শুরু করে এবং উভয়ে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। এই মিলনকেই আমরা বলী দুই মহানদীর মিলন বা গঙ্গা যমুনা সঙ্গম। এই মিলনের ফলে আর্যসংস্কৃতি ও সিন্ধু সভ্যতার সংস্কৃতির মধ্যে ব্যবধান ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে যায়। এই দুই সভ্যতার মিলন সক্রিয়ভাবে দেখা যায় ভারতের 'মধ্যদেশে' (বর্তমান বিহার ও উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চল)।

সিন্ধু ও আর্যসভ্যতার মিলনের পূর্ববর্তী প্রসঙ্গ আলোচনা করলে দেখা যায় আর্যগণ অস্ত্রশাস্ত্রের প্রয়োগ করে ভারতের আদি অধিবাসী বা অনার্য গোষ্ঠীকে পরাজিত করে ক্রীতদাসে পরিণত করেছিল। আর্যগন তাঁদের কৃষ্ণবর্ণ, খর্বাকায়, চ্যাপ্টা নাক, মোটা ঠোঁট এই দৈহিক গঠনের জন্য সুঠাম, সুকুমার আর্য নারী-পুরুষের কাছে উপহাসের পাত্র ছিলেন। অনার্য উপজাতিগুলির সঙ্গে আর্য সমাজের প্রতিলোম বিবাহে উৎপন্ন হীনজাতি একত্রিত হয়ে চন্ডাল, নিষাদ, পুক্কশ, কিরাত, শবর, ডোম, নলাকার, বেনুকার, কুম্ভকার, তন্তুবায়, চর্মকার, রথকার, নাপিত প্রভৃতি জাতি ও উপজাতির উন্মেষ হয়েছিল তৎকালীন যুগে। বন-জঙ্গল-পশু-পাখী, বৃক্ষ প্রকৃতি ছিল তাদের জীবনের অঙ্গ। তারা আর্যদের ন্যায় উদ্যমী কিন্তু সামাজিক অবজ্ঞা ও অবহেলা, কঠোর জীবনসংগ্রাম এঁদের চরিত্রকে হিংস্র করে তুলেছিল। কৃষিকাজ, পশুপালন, মৎস্য শিকার, শবদাহ, মাংসবিক্রয় ছিল এঁদের প্রধান জীবিকা। এঁরা ছিল লিঙ্গ উপাসক। এঁদের ছিল নিজস্ব রীতি-নীতি-ধর্মীয় বিশ্বাস। জাতকে এই অনার্যজাতি গোষ্ঠীর উপজাতিগত বৃত্তিরত্ত বহু পরিচয় পাওয়া যায়। বিজয়ী আর্যরা যখন সভ্য ও সঙ্গতি সম্পন্ন হয়েছিলেন তখন সকল প্রকার হীনকর্মগুলি অনার্যদের ওপর ন্যস্ত হয়েছিল। সমাজে এরা হীনবৃত্তিসম্পন্ন হীনজাতি বলেই পরিচিত ছিল। যদিও সমাজ

রক্ষার জন্য তথাকথিত হীন বৃত্তি সম্প্রদায়ের যোগদান ছিল অনস্বীকার্য। 'ভেরীবাদক জাতক' ও 'শঙ্খ জাতকে' দেখা যায় বেণুগণ খোল, করতাল নিয়ে বাদ্য বাজন করে জীবিকা নির্বাহ করত, পুক্কুশেরা বিলৌকাবধ বন্ধন দ্বারা অর্থাৎ যে সকল জন্তু গর্তে থাকে তাদের ধরে মেরে উদর পূর্তির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করত; যা নিষাদ সম্প্রদায়ভুক্ত বৃত্তির রূপান্তর। ভারতীয় সমাজে চন্ডালের স্থান অতি নিম্নে। জাতকেও সেই চিত্রের ব্যত্যয় ঘটেনি। প্রাচীন অন্যান্য সাহিত্যের ন্যায় জাতক সাহিত্যেও দেখা যায় তারা গ্রামের বাইরে থাকে, ভিক্ষা চাইলে সাধু ব্যক্তি তাদের সাক্ষাৎ ভিক্ষা দেয় না, ভৃত্য দ্বারা ভাঙ্গাপাত্রে ভিক্ষা দেয়; দৈবকর্মের অনুষ্ঠানে এদের মুখদর্শন করতে নেই, এরা নগর থেকে অনাথ শব শশ্মানভূমিতে বহন করে নিয়ে যায়, মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে শূলে চড়ানোর নারকীয় কার্যটি চন্ডালগণ সম্পন্ন করে। 'মাতঙ্গ জাতকে' দেখা যায় বারাণসীর ষোলহাজার ব্রাহ্মণ না জেনে একবার চন্ডালের উচ্ছিষ্ট ভোজন করেছিলেন বলে তাঁদের সমাজচ্যুত করা হয়েছিল। 'শ্বেতকেতু জাতকে' আছে চন্ডালের স্পৃষ্টবায়ু স্পর্শ করলেও নাকি দেহ অপবিত্র হয়। তাদের সংস্পর্শ দূরে থাক তাদের দর্শনেও মহা অমঙ্গল সূচিত হয়। 'মাতঙ্গ জাতকে' আরো জানা যায় এক শ্রেষ্ঠীকন্যা উদ্যানকেলির সময় চন্ডাল পুত্র মাতঙ্গকে দেখে অমঙ্গল নিবারণের জন্য গন্ধোদক দিয়ে চোখ পরিস্কার করে তবেই গৃহে ফিরেছিলেন। তবে শাবক জাতকে দেখা যায় চন্ডালদিগের মধ্যে পান্ডিত্য থাকলে লোকে তাদের গুণ ও গ্রহণ করত। 'আম্রজাতকে' দেখা যায় ইন্দ্রজালিক বিদ্যা অধ্যায়নের নির্মিত্ত এক ব্রাহ্মণ কুমার চন্ডালের দাসত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এই জাতিভেদ ছিল গৃহীদের মধ্যে, প্রব্রাজকদের মধ্যে কোন জাতিবিচার ছিল না। উল্লিখিত জাতি নিজেদের মধ্যে কুম্ভকার, তন্তুবায়, নাপিত উন্নতি লাভ করে আচরণীয় শ্রেণীভুক্ত হলেও নলাকার, চর্মকার, চন্ডাল গোত্রীয় জাতির মানুষ এখনও সামাজিক অবহেলার ও বক্রদৃষ্টির পাত্র। যেহেতু তথাকথিত এই হীনজাতি ও বৃত্তিসম্পন্ন অনার্যগণ নগরের বাইরে থাকত, নাগরিক জীবনের সাথে এই দুরত্বের ফলে এদের ভাষাও ছিল নাগরিক সমাজের ভাষা থেকে পৃথক। যদিও আর্যদের নিজস্ব ভাষা দেশের আদিম জাতিগোষ্ঠীর সংস্পর্শে এসে কিছু পরিবর্তিত হয়েছিল। সেরকমভাবে বিজিত অনার্যরাও বিজেতা আর্যদের ভাষা আয়ত্ত করতে গিয়ে বেশকিছু ব্যাঞ্জন ধ্বনি সমষ্টির উৎপত্তি হয়েছিল। ভাষাগত এই বিবর্তনের ফলে বর্ণ ও শব্দ ভান্ডার সমৃদ্ধ হয়েছিল। অন্যদিকে রক্তের সংমিশ্রণের ফলে জিনগত বৈচিত্রও এসেছিল। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে আক্রমণকারী আর্যরা প্রায়শই দেশীয় মেয়েদের বিবাহ করতেন কখনও বা তাঁদের উপপত্নী রূপে রাখতেন। তৎকালীন সমাজে তথাকথিত চারবর্ণের মধ্যে বিবাহবন্ধনের অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ

শাস্ত্রে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। এইভাবে ধর্ম ও সংস্কৃতির উপরও আর্য ও অনার্য সংমিশ্রণের ফলে একটি পরিবর্তনের ধারা এসেছিল। ফলে উদ্ভব হয়েছিল বিবিধ মিশ্রজাতির। জাতকে নিম্নলিখিত মিশ্রজাতির কথা জানতে পারি —

	পিতা	মাতা	জাতি
১।	শুদ্র	ব্রাহ্মণ	চন্ডাল
২।	ক্ষত্রিয়	শুদ্র	নিষাদ
৩।	নিষাদ	শুদ্র	পুক্কশ
৪।	নিষাদ	বৈদেহ	বর্বর
৫।	চন্ডাল	পুক্কশ	সোপক
৬।	নিষাদ	আয়োগব	কৈবর্ত
৭।	ক্ষত্রিয়	ব্রাহ্মণ	সুত
৮।	ব্রাহ্মণ	বৈশ্য	অমষ্ঠ
৯।	বৈশ্য	ব্রাহ্মণ	বৈদেহ
১০।	বৈদেহ	অমবস্থ	বেণ

এই মেলামেশায় মধ্য দিয়েই আর্য-অনার্য উভয় গোষ্ঠীর আচার-আচরণ, দৈহিক গঠন, বেশভূষা, খ্যাদ্যাভ্যাস, গৃহনির্মাণ পদ্ধতি, দেশাচার, লোকাচার, সামাজিক রীতি-নীতিতে ও বিস্তর পরিবর্তন এসেছিল। যেমন তারা শিকারী ও খাদ্যসংগ্রহকারীর স্তর থেকে খাদ্য উৎপাদক ও জীবজন্তুর পালক স্তরে উপনীত হয়েছিল। ব্যবসায়ে গোধনের পরিবর্তে ধাতুর মুদ্রা ব্যবহারের প্রচলন শুরু হয়েছিল। প্রকৃতি পুজারী বৈদিক আচারযুক্ত আর্যরা সমাজে অনার্যদের প্রভাবে লিঙ্গ উপাসনা সহ শক্তি বা দেবীর আরাধনা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। আর একটি পরিবর্তন এসেছিল রাজনীতিতে। গঙ্গার উত্তরের রাজ্যগুলি সাধারণ ভাবে ছিল গণতান্ত্রিক সেখানে বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকারীর ধারণা ছিল না। জনমন্ডলীর মিলিত সিদ্ধান্তে কোন একজনকে রাজা নির্বাচন করা হত। যেমন শাক্য, কোলিয়, লিচ্ছবী, বিদেহ প্রভৃতি। 'ভদ্রশাল জাতকে' দেখা যায় এঁরা 'গণরাজ্য' বলে অভিহিত। কিন্তু গঙ্গা যমুনার দোয়াব অঞ্চলে এবং গঙ্গার দক্ষিণ দিকে বড় বড় শক্তিশালী বংশভিত্তিক রাজতন্ত্রও গড়ে উঠেছিল যেমন বৎস, কোশল, কাশী, মগধ ইত্যাদি। এই সকল রাজ্যেরই অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল কৃষি ও বনজ সম্পদ। মগধে খনিজ সম্পদের প্রাচুর্যের ইঙ্গিতও পাওয়া যায়। কৃষি ও ব্যবসাবাণিজ্যের জন্য আর্যাবর্তের রাজ্যগুলির শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল এবং ক্রমে বড় বড় নগর গড়ে উঠেছিল। গড়ে উঠেছিল নগর সভ্যতা। তবে নগর ও গ্রামীন বসতি থেকে দূরে নদনদীর তীরে নির্জন অরণ্যে একাকী সাধনা অব্যাহত ছিল। সেখানে দেবদেবীর পরিবর্তে ব্রহ্মের স্বরূপ অন্বেষণ শুরু হয়েছিল।

এই আর্য-অনার্যের সামাজিক রাজনৈতিক বিবর্তনের সন্ধিক্ষণেই বৌদ্ধধর্মের প্রবক্তা গৌতব বুদ্ধ জন্মলাভ করেন (আনুমানিক ৫৬৩ খ্রীঃপূঃ)। বুদ্ধের আবির্ভাব পর্বে পঞ্চনদের তীরে বসতি স্থাপনকারী আর্য গোষ্ঠী ও গাঙ্গেয় উপত্যকার অনার্যগোষ্ঠীর জীবনযাত্রায় ও ধর্মীয় চিন্তাভাবনায় আরো একটি অভিনব পরিবর্তন শুরু হয়েছিল। যেখানে বারংবার উচ্চারিত হয়ে এসেছে ভবসংসারের দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য বেদ অনুসৃত যাগযজ্ঞ বা ঈশ্বরের প্রয়োজন নেই। তাঁর ধর্মের মূলগত উপাদান হল সত্য বা প্রকৃত জ্ঞানের অন্বেষণ। সেই প্রকৃত সত্য জ্ঞান ও সম্যক প্রচেষ্টায় সুকর্মের চর্চার দ্বারাই দুঃখ হতে মুক্তি সম্ভব। তাই তাঁর মূল সারবত্তাই ছিল 'অত্তদীপো ভব'— 'অত্তদীপে'র নিহিতার্থ অন্বেষণে আমরা দ্বিবিধ ব্যাখ্যা পাই। 'দীপ' অর্থাৎ 'আশ্রয়স্থল'; এই অর্থ অনুসারে নিজেই নিজের আশ্রয়স্থল হও বা আত্মশরণ হও বা নিজেই নিজের প্রদীপ বা 'জ্ঞানরূপ' আলোকবর্তিকা হও। অত্তদীপ প্রজ্জ্বলনে বা আত্মবিশ্লেষণে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবন পর্যবেক্ষণ, অন্বেষণ ও পর্যটনের চলমান দিকদর্শন নিহিত আছে জাতকে। সিদ্ধার্থ গৌতম নিজেকে কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করে বংশ, জাতি, সমাজ ও রাষ্ট্রের দর্পনে আত্ম অন্বেষণের অভিনব এক পন্থা নির্দেশ করেছেন জাতক কাহিনীগুলোর মধ্যে দিয়ে।

তাই এই প্রতিবেদন বা আলেখ্যটি আমাদের সহজেই যে এক-চূড়ান্ত উপলব্ধিতে পৌঁছে দেয় তা হল অতীত ও অনাগত ভারতের সেরা লোক কাহিনীর আধার হল জাতক। এখানে শুধু মানব সমাজের সুখ-দুঃখ সংকট সমাধানের কথা বলা নেই, বলা আছে সমগ্র প্রাণীকুলের কথা। এই চরাচরকে টিকিয়ে রাখতেই উদ্ভিদ কীটপতঙ্গ সহ সমগ্র প্রাণীকুলের আন্তরিক লালন প্রয়োজন।